দৈনিক সংবাদ

সংবাদ ৬

তারিখ 24 MAR 1987 পৃষ্ঠা 6

# রাষ্ট্রপতির জীবনালেখ্য

১৯৮৬ সালের ২৩শে অক্টোবর দেশের তৃতীয় নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শপথ গ্রহণের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। শপথ গ্রহণের পর পরই প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতির উদ্দেশে এক বাণীতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা এবং শোষণমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্যেও সকলের প্রতি আহবান জানান। যে মহান ব্যক্তিত্ব গত পাঁচ বছর ধরে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁর অনুসৃত নীতিমালা এই নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৩০ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী উত্তরাঞ্চলীয় জেলা রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন এবং ১৯৫৬ সালে কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হন। তিনি বিভিন্ন ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এডজুট্যান্ট জেনারেল হন। তিনি ১৯৭৫ সালে দিল্লীতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ কোর্সে যোগদান করেন। একই বছর তিনি সেনাবাহিনীর উপ-স্টাফ প্রধান হন। ১৯৭৮ সালের পয়লা ডিসেম্বর তিনি সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান হন এবং ১৯৭৯ সালে তিনি লেঃ জেনারেল পদে উন্নীত হন।

১৯৮১ সালের ৩০শে মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী গণতন্ত্র সমুন্নত রাখার এবং ১৯৮১ সালের নভেম্বরে একজন নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কতিপয় দুর্নীতিবাজ ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদেরকে জাহির করে এবং এর ফলে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অরাজকতা ও চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ক্ষমতা থেকে সরে গিয়ে যেদিন সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদের কাছে প্রশাসন পরিচালনার দুরূহ দায়িত্ব হস্তান্তর করলেন তার পূর্ব পর্যন্ত পরিস্থিতির ক্রম অবনতি হতে থাকে।

দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই জেনারেল এরশাদ জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রশাসন, কৃষি, বিচার বিভাগ, শিল্প, জমির ভোগ দখল ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রত্যাশিত ও অতি প্রয়োজনীয় বেশ কিছু সংস্কার প্রবর্তন করেন এবং এগুলোর প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে এবং ৪৬০টি উপজেলা গঠন করা হয়েছে। প্রশাসন এবং স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের সকল দায়িত্ব দেয়া হয়েছে উপজেলাগুলোকে। উপজেলার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। এ কারণে প্রশাসনকে জনগণের চাহিদার প্রতি সাড়া দিতে হচ্ছে এবং তাদের কাছে জবাবদিহি থাকতে হচ্ছে। পরবর্তী পর্যায়ে জেলা সংখ্যা ২১ থেকে বাড়িয়ে ৬৪টি করা হয়েছে এবং জেলাগুলোকে আরো সক্রিয় করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার মৌলিক ভূমি সংস্কারের লক্ষ্যে কতগুলো ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। কোন পরিবার ২০ একরের বেশী জমি রাখতে পারবে না। কোন বর্গা চাষীকে কোন জমি চাষ করতে দেয়া হলে সে এক নাগাড়ে অন্ততঃ ৫ বছর সেই জমি চাষ করতে পারবে। উৎপাদিত ফসল তিন ভাগ করা হবে— একভাগ জমি মালিকের, একভাগ সার, বীজ ইত্যাদি উপকরণ সরবরাহকারীর এবং একভাগ বর্গা চাষীর। একজন কৃষি শ্রমিককে পারিশ্রমিক হিসেবে দৈনিক অন্ততঃ সাড়ে তিন কে জি চাল কিংবা সমমূল্য দিতে হবে। এছাড়া বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সরকারী জমিতে ভূমিহীন লোকদের বসতির অনুমতি দেয়া হয়েছে। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ কাজ শুরু হয়েছে।

বিচারপূর্বক মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক আইন সংস্কার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপন করা হয়েছে এবং রাজধানী ঢাকার বাইরে কয়েকটি স্থানে হাই কোর্টের সেশন বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলের দেওয়ানী ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি সহজতর করে মামলার তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির জন্যে সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার শিল্প ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতকে উজ্জীবিত করে তুলেছেন এবং সরকারী খাতের ভূমিকার পুনর্ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সরকারী খাত এখন বেসরকারী শিল্পের সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে এবং বেসরকারী খাতে কোন শূন্যতা থাকলে তা পূরণ করবে। এই নীতি অনুসারে ৩৩টি জুট মিল ও ২৬টি টেক্সটাইল মিলের পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়েছে। বেসরকারী খাতে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ এই প্রথম বেসরকারী খাতে সাধারণ ও জীবন বীমা কোম্পানী চালানোর অনুমতি দেয়া হল। সরকার অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ নীতিও গ্রহণ করেছেন।

দেশের অর্থনীতি জোরদার [illegible] লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার গত পাঁচ বছরে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন সেগুলোতে বিপুল সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দুই গুরুত্বপূর্ণ খাত— কৃষি ও শিল্পের সাফল্য থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৮৫-৮৬ সালে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৬ শতাংশ। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অবদান ১৯৮২ সালের পর থেকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৪-৮৫ সালে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশ।

বিশ্ব ব্যাংকের ১৯৮৬ সালের বার্ষিক রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে— কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে উৎপাদন ব্যাহত হওয়া সত্বেও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৮১-৮৫) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের ধারা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। এই অব্যাহত অর্থনৈতিক বিকাশের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল স্বল্পমেয়াদী অর্থনৈতিক সমস্যাবলী এবং কৃষি, শিল্প ও রপ্তানি খাতের মৌলিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় সরকারের ক্রমবর্ধমান সামর্থ্য। ১৯৮৬ সালে জিডিপি প্রায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকারের ব্যাপক জনসংখ্যা পরিকল্পনা কর্মসূচীর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.২% থেকে ১৯৮৫ সালে ২.০৬%-এ নেমে এসেছে। ১৯৯০ সাল নাগাদ এই বৃদ্ধির হার ১.৭%-এ নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। জাতিসংঘ ১৯৮৭ সালের জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কারের জন্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে মনোনীত করে সম্প্রতি যে ঘোষণা দিয়েছে, তা এক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টারই একটি স্বীকৃতি।

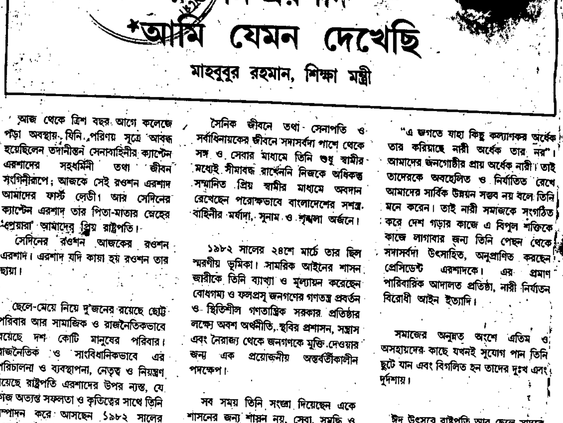

অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংস্কার সাধন করা হয়েছে। ১৯৮২ সালে একটি জাতীয় ওষুধনীতি তৈরী করা হয় এবং একটি ওষুধনীতি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশের প্রধান প্রধান লক্ষ্য ছিল বাজারে স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর ওষুধ বিক্রি বন্ধ, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো ও স্থানীয়ভাবে ওষুধ উৎপাদনে উৎসাহদান, উৎপাদন ব্যয় কমানো, কম দামে জনগণের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত এবং ক্ষতিকর ওষুধ ব্যবহার থেকে জনগণকে বাঁচানো। এই ওষুধনীতি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

এ ধরনের বৈপ্লবিক সংস্কার বাস্তবায়নের জন্যে একজন সাহসিকতাপূর্ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। প্রেসিডেন্ট এরশাদ দৃঢ়তার সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শুরু থেকেই গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে তিনি নির্বাচনের [illegible] এ ব্যাপারে বিরোধিতা [illegible] ছিল। কিন্তু ধৈর্য ও সমঝোতার মাধ্যমে তিনি সকল বাধা অতিক্রম করেন। ১৯৮৬ সালের মে মাসে সংসদ নির্বাচন এবং একই বছর ১৫ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ১৯৮৫ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা নির্বাচন।

দেশের ভেতরে অর্জিত সাফল্যসমূহের পাশাপাশি, প্রেসিডেন্ট এরশাদ অসংখ্য আন্তর্জাতিক ফোরামে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রনায়কত্ব প্রদর্শন করেছেন। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার চতুর্দশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন। দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের প্রথম শীর্ষ বৈঠক ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। বাংলাদেশ সার্কের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। সার্কের প্রথম মহাসচিব নিযুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ থেকে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতিসংঘ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ ও ৭৭ জাতি গ্রুপে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে বাংলাদেশের নির্বাচন, বিশ্ব সভায় বাংলাদেশের বাস্তব ভূমিকারই স্বাক্ষর বহন করছে। আল-কুদস ও ইরান-ইরাক যুদ্ধবিষয়ক শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ইরান ও ইরাকের মধ্যেকার ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি (১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ৭৭ জাতি এশীয় গ্রুপের ৬ষ্ঠ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক এবং বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জেনারেল এরশাদ সৌদী আরব, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ফিজি, নেপাল, চীন, মরক্কো, ফ্রান্স, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমীরাত, বার্মা, চেকোশ্লোভাকিয়া ও মালদ্বীপ সফর করেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি সফর করেন ইরাক, ভারত, সৌদী আরব, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, বাহামা, মালয়েশিয়া, ভুটান, নেপাল, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া ও কুয়েত।

পেশাগত জীবনে সৈনিক হলেও প্রেসিডেন্টের রয়েছে একটি সুন্দর কোমল কবি মন এবং জনগণের জন্যে রয়েছে তাঁর গভীর অনুভূতি। যুগ যুগের শোষণ ও বঞ্চনার কারণে জনগণের যে দুর্দশা, তা দেখে তাঁর মন কাঁদে। অসহায় মানুষের জন্যে তাঁর যে আবেগ ও ভালবাসা, তার মূর্ত প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর কাব্য সৃষ্টিতে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাশৈলী, শব্দ চয়ন ও ছন্দের জন্যে তাঁর কবিতার যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে। "কনক প্রদীপ জ্বালো" নামে তাঁর একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটির ইংরেজী, ফরাসী ও চীনা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং এর সংস্কৃতির প্রতি রয়েছে তাঁর গভীর অঙ্গীকার। তাঁর সরকার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মহান শহীদদের স্মরণে নির্মিত ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করেন এবং সম্প্রসারণ করেন। তিনি সাভারে জাতীয় শহীদ স্মৃতি সৌধের নির্মাণ কাজও সম্পূর্ণ করেন। মুজিবনগরে, যেখানে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় সেখান একটি স্মৃতি সৌধের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সৌন্দর্য বর্ধন ও সম্প্রসারণ করেন। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানদের জন্যে কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী। ফজর নামাজ আদায় করে তিনি দিনের কাজকর্ম শুরু করেন। তিনি বাস ভবনে এক ঘন্টা কাজ করেন এবং এরপর প্রায় প্রতিদিনই ঢাকার বাইরে যান। দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তিনি ছুটে বেড়ান। একটি সুখী, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের জন্যে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা মেহনতী জনগণকে বলেন। তিনি বঙ্গভবনে অতিথি ও প্রতিনিধি দলসমূহকে সাক্ষাৎ দান করেন, সেখানে বৈঠকে মিলিত হন।

একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে পরিচিত প্রেসিডেন্ট এরশাদ দু'বার হজ্ব আদায় করেছেন— ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে। উচ্চ সৌন্দর্য ও রুচিবোধসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট এরশাদ চিত্রকলা, সাহিত্য ও সংগীতের অনুরাগী। তিনি একজন একনিষ্ঠ পাঠক। তিনি সাধাসিধে পোশাক পছন্দ করেন, পরিমিত আহার করেন এবং ওজনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তিনি ফুল পছন্দ করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সব সময়ই খেলাধুলায় আগ্রহী। তিনি ১৯৪৮ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে এবং ১৯৫০ সালে ঢাকা বিদ্যালয় ইউওটিসি'র চ্যাম্পিয়ন ক্রীড়াবিদ ছিলেন। এমনকি এখনো, এত ব্যস্ততা এবং রাষ্ট্রীয় কাজ কর্মের মাঝেও তিনি কিছুটা সময় করে কুর্মিটোলা গল্‌ফ ক্লাবে গিয়ে গল্‌ফ খেলেন। এই গল্‌ফ ক্লাবও তিনিই গড়ে তুলেছেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্রীড়া তৎপরতার একজন মহান সংগঠক। সত্তর দশকের শেষের দিকে জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে তিনি সারাদেশে ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং ক্রীড়া তৎপরতা সংগঠনের মাধ্যমে ক্রীড়া উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। ক্রীড়া সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য ১৯৭৯ সালে তিনি জাতীয় ক্রীড়া পদক লাভ করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এখানকার সর্ববৃহৎ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, তখন দ্বিতীয় সাফ গেমস উপলক্ষে এখানে সমবেত হয় দক্ষিণ এশীয় সাতটি দেশের ক্রীড়াবিদরা।

জেনারেল এরশাদ বিবাহিত এবং তাঁর একটি ছেলে ও একটি পোষ্য কন্যা রয়েছে।



রাষ্ট্রপতি এরশাদের নির্দেশে নির্মিত মুজিব নগরের সৌধ

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 MAR 1987 পৃষ্ঠা 6

ঢাকা : মঙ্গলবার, ৯ই চৈত্র '১৩৯৩

# রওশন এরশাদ — আমি যেমন দেখেছি

মাহবুবুর রহমান, শিক্ষা মন্ত্রী

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে কলেজে পড়া অবস্থায় যিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন তদানীন্তন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন এরশাদের সহধর্মিনী তথা জীবন সংগিনীরূপে; আজকে সেই রওশন এরশাদ আমাদের ফার্স্ট লেডী। আর সেদিনের ক্যাপ্টেন এরশাদ তার পিতা-মাতার স্নেহের 'পেয়ারা' আমাদের প্রিয় রাষ্ট্রপতি।

সেদিনের রওশন আজকের রওশন এরশাদ। এরশাদ যদি কায়া হয় রওশন তার ছায়া।

ছেলে-মেয়ে নিয়ে দু'জনের রয়েছে ছোট্ট পরিবার আর সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে রয়েছে দশ কোটি মানুষের পরিবার। রাজনৈতিক ও সাংবিধানিকভাবে এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে রাষ্ট্রপতি এরশাদের উপর ন্যস্ত, যে কাজ অত্যন্ত সফলতা ও কৃতিত্বের সাথে তিনি সম্পাদন করে আসছেন ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ থেকে।

বাংলাদেশ আজকে গত পাঁচ বছরের ইতিহাসকে নিয়ে গৌরব করতে পারে। কারণ এই ইতিহাস সফলতার ইতিহাস, সংস্কারের ইতিহাস, সৃষ্টির ইতিহাস।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ উন্নত গণতান্ত্রিক শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা মুমূর্ষু অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার, অসহনীয় অপব্যয় অপচয় ও লোকসান থেকে জাতিকে মুক্তি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদ গ্রামবাসীর দোরগোড়ায় প্রতিষ্ঠা, বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, বর্ধিত পরিমাণ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, সবার জন্য শিক্ষার সাথে সাথে স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওষুধনীতি প্রণয়ন, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, জনসংখ্যারোধে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ তথা সর্বক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন।

সমৃদ্ধির সাথে সাথে শহর-নগর সৌন্দর্যকরণ, ঢাকা মহানগরীকে তিলোত্তমা করে গড়ে তোলা, ধর্ম এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি প্রদান, ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে কর্ম ও কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মকে দেশ গড়া ও স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য রাজনৈতিক ধর্ম হিসেবে গ্রহণ।

যুগান্তকারী বৈপ্লবিক ১৮ দফা কর্মসূচীর প্রণয়ন ও প্রবর্তক।

সবকিছুর পেছনে রয়েছেন যে মহানায়ক, তার পেছনে রয়েছেন প্রতিটি মুহূর্তে প্রেরণা ও পরামর্শের অন্যতম উৎস হিসেবে রওশন।

তিনি মনে করেন সবার উপরে মানুষ সত্য এবং মানুষের জন্য যে দেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, তাকে ধারণ ও গ্রহণ করতে হবে সকল ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে।

সৈনিক জীবনে তথা সেনাপতি ও সর্বাধিনায়কের জীবনে সদাসর্বদা পাশে থেকে সঙ্গ ও সেবার মাধ্যমে তিনি শুধু স্বামীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি নিজকে অধিকন্তু সম্মানিত প্রিয় স্বামীর মাধ্যমে অবদান রেখেছেন পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা, সুনাম ও শৃঙ্খলা অর্জনে।

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চে তার ছিল স্মরণীয় ভূমিকা। সামরিক আইনের শাসন জারীকে তিনি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করেছেন বোধগম্য ও ফলপ্রসূ জনগণের গণতন্ত্র প্রবর্তন ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবশ অর্থনীতি, স্থবির প্রশাসন, সন্ত্রাস এবং নৈরাজ্য থেকে জনগণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এক প্রয়োজনীয় অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ।

সব সময় তিনি সংজ্ঞা দিয়েছেন একে শাসনের জন্য শাসন নয়, সেবা, সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য শাসন।

গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে অদৃশ্য থেকে তিনি ছিলেন সম্পৃক্ত, করেছেন উৎসাহিত। ১৮ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিষদ গঠন, পরবর্তীতে জনদল প্রতিষ্ঠা তারপর জাতীয় ফ্রন্ট ও জাতীয় পার্টি গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে তার ছিল সুস্পষ্ট মতামত।

জনসমক্ষে তিনি ফার্স্ট লেডী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সমবায়ীদের এক মহাসম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। পরবর্তীতে নোয়াখালী পৌরসভার এক নাগরিক সম্বর্ধনায় উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয়বারের মত তিনি শুধু আমাকেই ধন্য করেননি, অনুপ্রাণিত করেছেন দেশগড়ার কাজে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সৈনিকদেরকে।

প্রথমবারের মত তিনি জনসভায় উপস্থিত হন ১৯৮৪ সালের মে মাসে রংপুরের এক বিশাল জনসভায়। মঞ্চে বসেন রাষ্ট্রপতির পাশে। সেই জনসভায় আমি দায়িত্ব গ্রহণ করি তদানীন্তন জনদলের মহাসচিব হিসেবে। ভাষণে তিনি আহবান জানালেন একাত্তরের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনে সমঝোতা ও একতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে জেলা, উপজেলা ও গ্রাম গড়ার সংগ্রামে এগিয়ে আসতে।

এরপর নারী জাগরণ ও নারী সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণে কয়েকটি অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও তিনি বেশী সময় থাকতে চেয়েছেন অপ্রচারিত ও অপ্রকাশিত। তার মতে, কর্ম ও সফলতাই প্রচারের সবচাইতে উৎকৃষ্ট বাহন।

"এ জগতে যাহা কিছু কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"। আমাদের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী। তাই তাদেরকে অবহেলিত ও নির্যাতিত রেখে আমাদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন। তাই নারী সমাজকে সংগঠিত করে দেশ গড়ার কাজে এ বিপুল শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য তিনি পেছন থেকে সদাসর্বদা উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করছেন প্রেসিডেন্ট এরশাদকে। এর প্রমাণ পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা, নারী নির্যাতন বিরোধী আইন ইত্যাদি।

সমাজের অনুন্নত অংশে এতিম ও অসহায়দের কাছে যখনই সুযোগ পান তিনি ছুটে যান এবং বিগলিত হন তাদের দুঃখ এবং দুর্দশায়।

ঈদ উৎসবে রাষ্ট্রপতি আর ছেলে সাদকে নিয়ে উপস্থিত হন এতিমদের মাঝে আর পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে মাতৃস্নেহ নিয়ে, সান্ত্বনা ও সাহায্য নিয়ে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তিনি হয়ে পড়েন উদ্বিগ্ন আর উদ্বেলিত। ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে ছুটে যান তাদের মাঝে কখনো একা কখনো রাষ্ট্রপতির সাথে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডীদের সংগঠনে রওশন এরশাদ একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

নীরবে নিভৃতে দেশ এবং দেশবাসীদের স্বার্থে সদাসর্বদা সজাগ থেকেও নিয়মিত ধর্মকর্মে তিনি রয়েছেন সক্রিয়। নামাজান্তে দুহাত তুলে দোয়া করেন দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গল, কল্যাণ এবং সমৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত স্মরণ করেন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে।

আর্তজনের দুর্দশা ও দুঃখে প্রেসিডেন্ট ও রওশন এরশাদ দু'জনকেই দেখা গেছে শুধুমাত্র বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হতেই নয়, অধিকন্তু অশ্রুসজল নয়নে। তাই সেদিন ময়মনসিংহ রেল স্টেশনে নিহত টিটিই তোফাজ্জলের বিধবা স্ত্রী ও এতিম সন্তানদের পাশে রাষ্ট্রপতির সাথে গিয়ে দাঁড়াতে। উভয়কে সেদিন জাতি দেখেছে অশ্রু বিসর্জনরত।

বিগত দিন থেকে নীরবে নিভৃতে পিছনে থেকে তিনি যে অবদান রেখে যাচ্ছেন, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে আমরা তা স্মরণ করি বর্তমান সরকারের পাঁচ বছর পূর্তি [illegible] আজকের এই শুভ দিনে [illegible] এরশাদ আমাদের অহংকার, রওশন আমাদের গৌরব।